শিল্প নগরীর ঐতিহ্য হারিয়েছে খুলনা

- সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে ১৫টি মিল
- উৎপাদন বন্ধ ১১টির
- বেকার হয়েছে ৬ লাখ শ্রমিক

সাজেদুর রহমান

খুলনা ছিল শিল্পনগরী, শ্রমিকের শহর। আর খালিশপুর ছিল তার প্রাণকেন্দ্র। এক সময় এখানে শ্রমজীবী মানুষের কোলাহল, আত্মিক সৌহার্দ্য, সাইরেনের শব্দের সঙ্গে যন্ত্রের অবিরাম ছন্দমিল ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু আজ এর কিছুই নেই। এখন শুধু ভাঙা হাটের শূন্যতা খালিশপুরে। আসলে কারখানা তো শুধু যন্ত্রের সমষ্টি নয়, এর সঙ্গে জড়িত শ্রমিকরাই কারখানার প্রাণ। বরিশাল, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বগুড়া, পাবনাসহ নানা জেলা থেকে আসা শ্রমিকদের শহর খালিশপুর। এদের ঘিরেই ছিল কত আয়োজন। বাজার, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল কত কি! সেই খালিশপুর এখন বিষাদের নগরী।

পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশকের মধ্যবর্তী সময়কালে খুলনায় বেশকিছু ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট মিল, বিখ্যাত পাটকল ক্রিসেন্ট জুট মিলসহ ১৯টি বড় শিল্প গড়ে ওঠে। এ ছাড়া হার্ডবোর্ড মিল, ফ্রগলেস, রড মিল, দিয়াশলাই, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ ১৫টির মতো মাঝারি শিল্পও গড়ে ওঠে। নব্বইয়ের দশকে মিলগুলোর ভাগ্যে নেমে আসে বিপর্যয়। মুক্তবাজার অর্থনীতির ধাক্কায় একের পর এক মিল বন্ধ হয়ে যায়। যেগুলো বন্ধ ঘোষণা হয়নি সেগুলোকে রাখা হয় লে-অফ (উৎপাদন বন্ধ) করে।

বেকার শ্রমিকদের দুঃসময়

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন কাজী রফিকুল ইসলাম। আঞ্চলিক ভাষায় চমৎকার কবিতা লিখতেন তিনি। ১৯৯০ সালে সুকান্ত স্বর্ণপদকও পেয়েছিলেন। সেই কবি-শিক্ষক আজ মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। স্থানীয়রা জানায়, নিউজপ্রিন্ট মিল বন্ধ হলে সংশ্লিষ্ট স্কুলটিও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে স্কুলটি ক্ষুদ্র পরিসরে বেসরকারিভাবে চলার ব্যবস্থা নেন কয়েকজন শিক্ষক। রফিকুল ইসলাম তাতে বাদ পড়েন। হঠাৎ করে চাকরি হারিয়ে তিনি হতবিহ্বল হয়ে পড়েন। বাংলা শিক্ষকের প্রাইভেট চাহিদা নেই। নতুন কোনো কাজেরও অভিজ্ঞতা নেই। সব মিলিয়ে তিনি মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে পারলেন না- বলে জানালেন স্কুলের শিক্ষক আজিজুর রহমান। তিনি আরো জানান, 'রফিক স্যার পথেঘাটে উদ্দেশ্যবিহীন ঘোরাফেরা করেন। নোংরা কাপড় পরেন। পরিচিতজনের দেখা পেলে অসংলগ্ন কথা বলে টাকা ধার চান।'

শুধু রফিকুল ইসলামই নন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন ২৭ বছরের টগবগে যুবক মারুফি আজম মিঠু। তার পারিবারিক সূত্র জানায়, মিঠু ১৯৯৭ সালে এইচএসসি পাস করে হার্ডবোর্ডে অস্থায়ীভাবে বার্কার প্ল্যান্ট চাকরি নেন। ২০০০ সালে শ্রমিক নেতাদের ধরে প্রায় দেড় লাখ টাকা ঘুষ দিয়ে চাকরি স্থায়ী করেন। অথচ ২০০১ সালে মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। এক দিকে চাকরি হারানোর শোক, অন্যদিকে চাকরি স্থায়ী করার জন্য বিভিন্নজনের কাছ থেকে নেয়া ঋণ। পাওনাদাররা নিয়মিত এসে তাগাদা দেয়। দরিদ্র মিঠু পাওনাদারদের ভয়ে অধিকাংশ সময় ঘরে আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে এক পর্যায়ে তিনি ঘর থেকে বের হওয়াই বন্ধ করে দিলেন। অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, মিঠু এখন কারো সঙ্গেই কথা বলেন না। ঘর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও বের হন না। জোরে কোনো শব্দ হলেই লুকিয়ে পড়ার চেষ্টা করেন।

চাকরি হারিয়ে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত এ রকম অন্তত ২০ জন শ্রমিকের সন্ধান পাওয়া যায়। যারা মানসিকভাবে সুস্থ তাদের একটা বড় অংশ এখন দিনমজুর অথবা ভিক্ষা করে।

শ্রমিকদের স্কুলপড়ুয়া ছেলেরা কেউ রিকশা চালায়, আবার কেউ দোকানের কর্মচারী। দৌলতপুর জুটমিলের অনেক শ্রমিক পরিবার এখন ভিক্ষা করে সংসার চালাচ্ছে। মিল বন্ধের আগে ১৩ জন শ্রমিক বিভিন্ন কারণে মারা গেলেও তাদের পাওনা ১১ লাখ ৫৬ হাজার ৭৯৬ টাকা পায়নি তাদের পরিবার। মিল কর্তৃপক্ষ ও বিজেএমসির কাছে বার বার ধরনা দিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। শেষে কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তি বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মিলের ওয়ার্কসপ বিভাগের শ্রমিক আবু বকরের (টোকেন নং-২৪০০) পাওনা রয়েছে ৬৭ হাজার ৩২০ টাকা। অথচ তার স্ত্রী চারটি কন্যাসন্তান নিয়ে ভিক্ষা করছেন বলে জানা যায়। আবার উইভিং বিভাগের শ্রমিক আফজাল হোসাইন (টোকেন নং-১৯০৫)-এর পাওনা ৭২ হাজার ২২০ টাকা পাবে। তার স্ত্রী অন্যের বাসায় কাজ করে সংসার চালাচ্ছে। শ্রমিক মোঃ ইসাহাক মিয়া (টোকেন নং-১৯২), নুরুল ইসলাম (টোকেন নং-১১৯১), মোশাররফের হোসাইন (সিকিউরিটি গার্ড), রবীন্দ্রনাথ (টোকেন নং-৭২৭), ইস্কান্দার আলী (টোকেন নং-২৪১৯), মফিজুর রহমান (ইউডিএ), আব্দুল জলিল (টোকেন নং-১৮৮), নিখিল চন্দ্র শীল (সুইপার), আব্দুল হাকিম শিকদার (এলডিএ), ফরিদ উদ্দিন আহমেদ (রফতানি), ফরিদ উদ্দিন আহমদ (রফতানি) এবং শান্তি রঞ্জন রায় (ইউডিএ)। এদের পাওনা মিলের কাছে সব মিলিয়ে লাখ টাকার বেশি হলেও তাদের পরিবার পরিজনকে সমাজের নিম্নশ্রেণীর পেশায় অংশ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরতে হচ্ছে।

শূন্য বিআইডিসি রোডের একাংশ

এ ছাড়াও মিল বন্ধের পর অনেক শ্রমিক ও শ্রমিক নেতা এখন রিকশা চালানোসহ বিভিন্ন উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। দৌলতপুর জুটমিলের সাধারণ সম্পাদক জাহিদ হোসেন একটি ছোট মুদির দোকান দিয়েছে। অনেকে মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে। এমনকি কেউ কেউ আত্মহত্যাও করেছে। শুধু খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল নয় বন্ধ হয়ে যাওয়া ১৫টি বিভিন্ন পাটকল ও শিল্প এবং উৎপাদন বন্ধ থাকা ১১টি কারখানায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লাখ লোকের বাস ছিল খুলনায়। মিলগুলোর অব্যাহত বন্ধ হওয়ার পর প্রায় ৭/৮ লাখ মানুষ শহর ছেড়ে নিজের গ্রামের বাড়ি বা অন্যত্র চলে গিয়েছে বলে স্থানীয় একটি বেসরকারি সংস্থা জানায়। সংস্থাটিতে পুরো এলাকায় জরিপ চালিয়ে দেখে, মিলগুলো বন্ধের ফলে প্রায় ৬ লাখ মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়েছে, যাদের বয়স ২৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে। বেকার শ্রমিকদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কাজ করছে বা করার চেষ্টা করছে। বাকি ৬০ শতাংশ এখনো নতুন কোনো কর্মসংস্থান করতে পারেনি। বিশেষ করে ৩৫ থেকে ৪৫-এর মধ্যে বয়স সীমার শ্রমিকরা একদিকে মিল থেকে ক্ষতিপূরণ কম পেয়েছে, অপরদিকে নতুন চাকরি খোঁজার বয়সও পেরিয়ে গেছে। এই শ্রেণীর শ্রমিকদের দুর্গতি অসহনীয়।

দরিদ্র শ্রমিকদের নিয়ে নির্মম ব্যবসা : যেসব পাটকল এখনো যেসব এলাকায় সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি, সেসব এলাকায় শ্রমিকদের নিয়ে চলছে এক নির্মম ব্যবসা। পাটকল শ্রমিকরা মজুরি পায় দৈনিক ৬০ থেকে ৭৫ টাকা। সে হিসেবে সপ্তাহে প্রাপ্য ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা সপ্তাহান্তে সেই টাকা শ্রমিকদের দেয়ার নিয়ম থাকলেও সপ্তাহ শেষে মিল কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের একটা স্লিপ ধরিয়ে দিয়ে বলে, 'টাকা নেই। টাকা এলে স্লিপ দেখিয়ে নিয়ে যেও।'

এভাবে প্রায় দু-তিন সপ্তাহ বিল না দিয়ে শ্রমিকদের স্লিপ ধরিয়ে দিতে থাকে। শ্রমিকরা তখন বাধ্য হয়ে ওই স্লিপ ২০ থেকে ৩০ শতাংশ কমে একশ্রেণীর চতুর ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়।

এভাবে দরিদ্র শ্রমিকদের কাছ থেকে ওই স্লিপ নিয়ে ব্যবসায়ীরা মিল থেকে পুরো টাকা তুলে নেয় মিল প্রশাসনের সঙ্গে যোগ সাজশে। আফিল জুট মিলের বেসিনব্রেকার ওজিউল্লাহ জানান, আমার ১৪ সাপ্তাহের স্লিপ জমা ছিল। মিলে টাকা আসে কিন্তু আমরা পাই না। বাধ্য হয়ে দু'দিন আগে বিক্রি করে দিয়েছি। ওজিউল্লাহর মতো প্লাটিনামের শ্রমিক লিয়াকতও জানান, ওই বিশেষ ধরনের ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি হওয়ার কথা।

পেছনের কথা : জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে ('৫৮-৬৮) পূর্ব পাকিস্তানে একসঙ্গে ৭৭টি পাটকল স্থাপিত হয়। খুলনা, ঢাকাসহ অন্যান্য জেলায় এই মিলগুলো স্থাপিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রী খান এ সবুর ভৈরব নদীর তীরঘেঁষে পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপন করেন। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো হলো খুলনা নিউজপ্রিন্ট, খুলনা হার্ডবোর্ড মিল, দৌলতপুর জুট মিল, প্লাটিনাম জুট মিল, ক্রিসেন্ট জুট মিল, পিপলস জুট মিল, আলিম জুট মিল, আফিল জুট মিল, ইস্টার্ন জুট মিল, জে. জে. আই, কার্পেটিং স্টারসহ রডমিল, ফ্রগলেস ও দিয়াশলাই। এর ২টি ব্যক্তিমালিকানাধীন, বাকি সব সরকারি পর্যায়ের। স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারিভাবে চলছিল পাটকলগুলো। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সব মিল রাষ্ট্রায়াত্ত্ব হয়ে যায়। সরকার এই মিলগুলোতে সব দক্ষ লোক নিয়োগ করতে পারেনি। এমপি, সামরিক অফিসার ও নানা শ্রেণীর অদক্ষ লোক দিয়ে মিল চালু করে। ফলে অদক্ষতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে মিলগুলো লস দিতে শুরু করে। এছাড়াও সঠিক সময়ে পাট না কেনা, অন্য সময়ে চড়াদামে কেনাসহ নানা জটিলতায় মিলগুলো আটকে যায়। '৮২ সালে তৎকালীন সরকার মিলগুলোকে উজ্জীবিত করার একটা

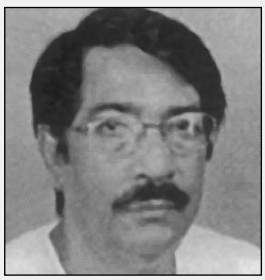

'বন্ধ পাটকলগুলো সচল ও লাভজনক করতে চেষ্টা করছি'

শাজাহান সিরাজ

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী

পাটকলগুলোর নাজুক অবস্থা নিয়ে বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী শাজাহান সিরাজ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি বন্ধ পাটকলগুলো চালু করাসহ সচল পাটকলগুলোকে লাভজনক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে। কিন্তু পাট কেনার ক্ষেত্রে আমাদের প্রত্যাশিত ২৬০ কোটি টাকার বিপরীতে সরকার মাস বিলম্বে ৩০ কোটি টাকা দেয়। এছাড়াও আরো ৩০ কোটি টাকা দেয় ব্যাংক ঋণ হিসেবে। ফলে এই টাকা বিজেএমসিকে সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। পাট কেনার ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দের অবস্থা এ রকম হলে কিভাবে উন্নতি হবে?'

তিনি বন্ধ হওয়া মিলের শ্রমিকদের ব্যাপারে বলেন, 'কিছু শ্রমিকের বদলি করে অন্য চালু মিলগুলোতে স্থানান্তর করলেও একটা বড় অংশের শ্রমিকদের কাজ দেয়া সম্ভব হয়নি। তবে পাটের ব্যবহার বাড়িয়ে এবং বিদেশীদের চাহিদা তৈরি করতে পারলে অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব। আমরা সে চেষ্টায় করছি।'

প্রক্রিয়া চালান। স্বাধীনতার আগের ব্যক্তিমালিকানাধীন মিলগুলোকে আবার ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করা। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকারি মিলগুলো প্রতিযোগিতা করলো বটে, তবে তা দুর্নীতির প্রতিযোগিতা- সুনীতির নয়।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল

১৯৫৪ সালে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরু থেকেই সুনামের সঙ্গে ও লাভজনকভাবে উৎপাদন হয়েছে মিলটিতে এটি পরিণত হয়েছে এশিয়ার সর্ববৃহৎ নিউজপ্রিন্ট কারখানায় ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীনের পরও মিলটি তার গৌরব ধরে রেখেছিল। ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে মিলটি মুনাফা করে ৬২ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। কিন্তু মুক্ত বাজার অর্থনীতির সুযোগে দায়িত্বপ্রাপ্ত অসৎ, অদক্ষ ও দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তারা মিলটিকে ধীরে ধীরে রুগ্ণ করে ফেলে। সিবিএ সভাপতি নিজামুর রহমান বলেন, 'সাইফুর রহমান আগের বার বিএনপি সরকারের অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন মুক্তবাজার অর্থনীতির আওতায় (কাগজ) আমদানির ওপর আরোপিত শতভাগ শুল্ক প্রত্যাহার করেন। ফলে মিলটি নিউজপ্রিন্ট বিপণনে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। সেই সঙ্গে আরম্ভ হয় বিপর্যয়। শেষমেষ লোকসানের অজুহাতে সরকার নিয়ে মিলটি বন্ধ করে দেয় গত ৩০ নবেম্বর ২০০২ সালে। সেই সঙ্গে প্রায় ৩ হাজার প্রত্যক্ষ শ্রমিকসহ প্রায় ১ লাখ মানুষের ভাগ্যে নেমে আসে অন্ধকার। অথচ ৪৩ বছরে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের মোট লোকসান ৩৫৭ কোটি টাকা।

বন্ধের তালিকায় যুক্ত হলো ক্রিসেন্ট জুট মিল : খালিশপুরের ক্রিসেন্ট জুট মিলের উৎপাদন বন্ধ হয়েছে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ থেকে। এ নিয়ে খুলনাঞ্চলের ১৭টির মধ্যে ১০টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেল। ক্রিসেন্ট ছিল আদজমী জুট মিলের পর বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জুট মিল। ১৯৫২ সালে ১১৩ দশমিক ৩ একর জমির ওপর আগা খান গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এবং মেসার্স র‍্যালি ব্রাদার্স লিমিটেডের যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় মিলটির নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে এর প্রথম ইউনিট চালু হয়। এতে তাঁত সংখ্যা ছিল ৫৩৩টি। ১৯৬৩ সালে চালু হয় দ্বিতীয় ইউনিট। এতে তাঁত সংখ্যা ছিল ৫০০। ১৯৬৯ সালে শুধু সিবিসি তথা কার্পেট ব্যাকিং ক্লথ তৈরির জন্য তৃতীয় ইউনিট চালু করা হয়। এতে তাঁত সংখ্যা ছিল ১০৩। বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত মিলে ১ হাজার ৩৩টি ন্যারো তাঁত এবং ১০৩টি সিবিসি তাঁতসহ মোট ১ হাজার ৩৬টি তাঁত রয়েছে। মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৬ হাজার ৮৮০ টন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের একজন জানান, সরকার পাটের ভরা মৌসুমে টাকা দেয় না। পাট কেনে না। পাট যখন কেনে তখন বেশি দরে কিনতে হয়। ফলে পণ্য উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। অতিরিক্ত

বন্ধ দৌলতপুর জুট মিলস্-এর সম্মুখ ভাগ

দামের কারণে দিনকে দিন মিলের লোকসান বেড়ে যায়। সরকার তাই বন্ধ করে দিয়েছে।' তিনি আরো জানান, পলঠককসানের পরিমান কয়েক হাজার কোটি টাকা হবে।

মাড়োয়ারি জুট মিল : ২২.৫৯ একর জায়গা জুড়ে সোহাস লাল সেটিয়া ১৯৫২ সালে মিলটি প্রতিষ্ঠা করেন। সোহাস লাল ভারতীয় নাগরিক, তবে জাতে মাড়োয়ারি ছিলেন। সেই থেকে মিলটি মাড়োয়ারি জুট মিল বলে পরিচিত। তবে কাগজে-কলমে মিলটির নাম দৌলতপুর জুট মিলস লিমিটেড। 'মিলটি বন্ধ হয় ২০০২ সালের ৭ ডিসেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে।' তথ্যটি দিলেন মিলের শ্রমিক আবুল হাসেম। তিনি ইলেকট্রিক সেকশনে কাজ করতেন। মিলটি বন্ধ হওয়ায় এখন বেকার। বন্ধ হওয়া মিলের শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ২০০, তাঁতের সংখ্যা ছিল ২৫০টি। এখানে শুধু চট তৈরি হতো। বার্ষিক উৎপাদন ছিল ৬ হাজার মেট্রিক টন।

মাড়োয়ারি মিলটির প্রধান গেট বন্ধ। তবে পকেট গেট খোলা। সেদিক দিয়ে মিলের ভেতর উঁকি দিতেই দারোয়ান এগিয়ে এলো। আমার আসার কারণ জেনে নিয়ে অপেক্ষা করতে বলল। দারোয়ানের কাছ থেকেই জানা গেল আগের রাতে ভৈরবের তীর দিয়ে চোর ঢুকে মিলের গোডাউন থেকে বেশ কিছু মূল্যবান যন্ত্রপাতি চুরি করেছে। সে কারণে বর্তমান মিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার মারুফসহ কয়েকজন কর্মকর্তা মিলের ভেতরে গেছেন পরিদর্শনে। একটু পরেই কর্মকর্তারা এলেন। তারা অবশ্য আগের রাতের চুরির কথা অস্বীকার করেন। তবে মিলের অনেক জিনিসপত্রই যে মাঝে মাঝে খোয়া যাচ্ছে তা স্বীকার করলেন। তারা জানালেন, মিলটি শেষ পর্যন্ত লাভজনক ছিল। তারপরও বেসরকারি করণের হুজুগে সরকার মিলটি ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার উদ্যোগ নেয়। এ জন্য মিল বিক্রি সংক্রান্ত একটি টেন্ডার দেয় বিজেএমসি আগস্ট ২০০২-এ। আকিজ জুট মিলের মালিক ৯২ কোটি টাকার মিলকে সর্বোচ্চ ১৩ কোটি টাকা দরে কেনার প্রস্তাব দেয়। সেই প্রেক্ষিতে ডিসেম্বরে মিলটিকে বন্ধ ঘোষণা করে বিজেএমসি। কিন্তু কি এক কারণে আকিজ সাহেব জানুয়ারি ২০০৩ মিলটি কিনতে অস্বীকৃতি জানান। পরবর্তীতে কাজী শাহেদ আহমদ ১১ কোটি টাকা দিয়ে মিলটি কেনার প্রস্তাব দিলেও বিজেএমসি তাতে রাজি হয়। কাজী শাহেদ আহমদ আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্ট বিধায় সরকার তার কাছে মিলটি দেয়নি। যার ফলে মিলটি আজও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আছে।

প্লাটিনাম জুট মিল : এর উৎপাদন শুরু হয় ১৯৫৮ সালে। মিলটিতে ৫০০ ছোট লুম এবং ৭৭টি বড় লুম আছে। শ্রমিক সংখ্যা ৩ হাজার ৯০০। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৭০-৭২ টন। গত ডিসেম্বর থেকে পুরোপুরি উৎপাদন বন্ধ রয়েছে। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ৭ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাকি ৩ মাসের। মিলের শ্রমিক নেতা মোতাহার হোসেন জানান, সরকার এই মিলটিকে ১০০ কোটি টাকা দেবে। তবে কবে নাগাদ দেবে সে বিষয়ে কেউ কিছু জানেন না। এ মিলেও নিত্যনৈমিত্তিক যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাচ্ছে। সিকিউরিটি অফিসার কামাল জানালেন, আমরা নিরাপত্তা দিতে হিমশিম খাচ্ছি। 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়'- বলল শ্রমিক ইউনুস মিয়া। সে জানালো, 'শ্রমিকদের টাকা দেয় না, ঈদ বোনাস তো দূরের কথা, বেতনও নেই। আমরা (শ্রমিক) এবার ঈদের দিনেও প্রতিবাদ করেছি। ঈদের দিন রাজপথে কালোব্যাজ পরে ঈদের নামাজ পড়েছি।

পিপলস জুট মিলস : পিপলস জুট মিলে ১৯৫৪ সালে প্রথম উৎপাদন শুরু হয়। প্লাটিনামের মতো গত বছরই পলে-অফ করা হয়েছে মিলটিতে। এই মিলে ৭শ' ৭২টি ছোট লুম এবং ৮২টি বড় লুম আছে। এখানে শ্রমিক সংখ্যা ৩ হাজার ৬শ' ৭২ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬০/৬২ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ১১ সপ্তাহের এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাকি ৪ মাসের। এ মিলের প্রধান উৎপাদিত পণ্য চট ও বস্তা। একসময় চীন, কোরিয়া, ডেনমার্কসহ বিভিন্ন দেশে পণ্য রপ্তানি হতো।

আটরার মিল ইস্টার্ন ও আলিম : খুলনার আটরা শিল্পাঞ্চলের মধ্যে ইস্টার্ন অন্যতম। মিলটির উৎপাদন শুরু হয় ১৯৬৬ সালে। বর্তমানে ২৫৬টি ছোট লুম এবং ৩৫টি বড় লুম আছে। এর শ্রমিক সংখ্যা ১৪০০ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২০ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ১৫ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন বাকি ৫ মাসের। আটরার আর একটি জুট মিল আলীম। এ মিলটির দশাও অন্যগুলোর মতো। ১৯৬৮ সালে মিলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ মিলের লুমের সংখ্যা ২৫০টি।

শ্রমিক সংখ্যা ৯শ' ৮৪ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ২০ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ১৪ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন বাকি ৫ মাসের।

ভৈরবের অপর তীরে স্টার : স্টার জুট মিল অবস্থানগত দিক থেকে একটু অন্যরকম। সবকটা পাটকল ভৈরবের পূর্ব তীরে প্রতিষ্ঠিত হলেও পশ্চিমে একমাত্র মিল হলো স্টার। সম্পূর্ণ নদীপথ কেন্দ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই মিলটি ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলের লুমের সংখ্যা ৬৯০টি। এর শ্রমিক সংখ্যা ২ হাজার ৯শ' ৪৬ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ৫ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ৩ মাসের বেতন বাকি।

কার্পেটিং ও জেজেআই : রাজঘাটে অবস্থিত কার্পেটিং এবং জেজেআই যথাক্রমে ১৯৬৬ এবং ১৯৭০ সালে উৎপাদন শুরু করে। কার্পেটিং মিলে ৮৪টি বড় লুম আছে। এর শ্রমিক সংখ্যা ৬১৩ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১২ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ১১ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ৪ মাসের বাকি। অপরদিকে জেজেআইতে ৩০৫টি ছোট লুম এবং ৫৪টি বড় লুম আছে। এর শ্রমিক সংখ্যা ১৫১৫ জন। উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩০ টন। শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি ৮ সপ্তাহ এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে বেতন ৪ মাসের বাকি।

আন্দোলনরত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের একাংশ

জামায়াত নেতার দখলে আফিল : ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খানের আমলে প্রতিষ্ঠিত মালিকানাধীন আফিল জুট মিল এখন জামায়াত নেতা মিয়া গোলাম কুদ্দুছের দখলে। তিনিসহ তার সাঙ্গপাঙ্গরা ২০০৪ সালের জুলাই থেকে ৫ বছরের জন্য লিজ নিয়েছে মিলটি। কুদ্দুছসহ আফিল জুট মিলে বর্তমানে ১২ জন পরিচালক এবং একজন উপদেষ্টা হিসেবে পরিচয় দেন। পরিচালকরা হলেন- মিয়া গোলাম কুদ্দুছ, শেখ আকরাম হোসেন, এস এ রহমান বাবুল, বেগ আব্দুর রাজ্জাক, শেখ আক্তার হোসেন, সৈয়দ বেলায়েত হোসেন, আলী আহমদ, মির কায়সেত আলী, জাহাঙ্গীর হোসেন, গোলাম কিবরিয়া, সৈয়দ কিসমত আলী ও আফিল উদ্দিনের বড় ছেলে আব্দুল কাদের পিন্টু। অভিযোগ রয়েছে গোলাম কুদ্দুছ মিলটি নিয়ে রীতিমতো ছিনিমিনি খেলছেন। লোক দেখানো ভাবে মিলটি চালু রাখলেও সরেজমিনে দেখা যায়, মিলের ভেতরে করুণ দশা। সমস্ত যন্ত্রপাতিই অকেজো। জংধরা লুম ও তাঁত। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি এই প্রতিবেদক সন্ধ্যা ৭টায় যখন মিলের ভেতরে ঢোকেন তখন মিলের একটি তাঁতে আগুন লাগে। মিলের উপদেষ্টা মিল্লাত সাহেব জানালেন, মিলে এ রকম আগুন প্রায়ই লাগে। পুরনো বৈদ্যুতিক লাইন। যখন-তখন শর্টসার্কিট হয়ে যায়। তিনি জানালেন, কিছুটা সংস্কার করে ৮৫ জন শ্রমিক নিয়ে একটি তাঁত চালু করা হয়েছে। পরিচালকরা চেষ্টা করছেন বড় অর্থায়নে। ব্যাংক ঋণ দিলে, মিলটি আবার পুরোদমে চলবে মিল দখলের বিষয়ে একাধিকবার চেষ্টা করেও গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে কথা বলা যায়নি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আরো জানান, মিলটিকে দেখিয়ে কুদ্দুছসহ কয়েকজন ব্যাংক থেকে বড় অঙ্কের ঋণ নিবে ঠিকই, কিন্তু তারা কেউ মিল চালাবে না।

ব্যবসায়ী আফিল উদ্দিন স্বনামে মিলটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৬৫ সালে। স্বাধীনতার পর অন্যান্য জুট মিলের মতো এ মিলটি জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৮২ সালে আবার জিয়াউর রহমান মিলটিকে বিরাষ্ট্রীয়করণ করেন। প্রসঙ্গত আফিল উদ্দিন অপ্রত্যাশিতভাবে মিলটি ফেরত পেয়ে স্বেচ্ছাচারীভাবে চালু করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিলটি বড় ধরনের লোকশানী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

আফিল জুট মিলে কাগজে-কলমে ২৫০টি লুম আছে। ৮০০ স্পিন্ডেল আছে। শ্রমিক সংখ্যা ১২৫০ জন। এর মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১ হাজার। অন্যান্য পাটকলের চেয়ে এ মিলের শ্রমিকের পারিশ্রমিক কম। পুরুষ শ্রমিক দৈনিক ৬৫ টাকা, নারী শ্রমিক মাত্র ২৫ টাকা পায়।

হার্ডবোর্ড মিল : দেশের একমাত্র হার্ডবোর্ড তৈরির প্রতিষ্ঠান ছিল খুলনা হার্ডবোর্ড মিল। নিউজপ্রিন্টের পাশাপাশি একই সঙ্গে এবং একই সময়ে মিলটি চালু হয়। বন্ধ হয় ১৬ ডিসেম্বর ২০০২। মিলটির সম্পদের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা। শ্রমিক ছিল প্রায় ১ হাজার। শেষ দু'বছর মিলটি লোকসান গুলোকে যথাক্রমে দেড় কোটি ও ২ কোটি টাকা। বর্তমান দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মির শাহদত হোসেন বলেন, 'মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রত্যক্ষ ফলই মিলটি বন্ধ হওয়ার অন্যতম কারণ।

শ্রমিকের প্রতিবাদ জোরালো হচ্ছে

মূলত অর্থের অভাবে ২০০২ সালে লে-অফ করা হয় পিপলস, স্টার ও ইস্টার্ন জুট মিল। তীব্র শ্রমিক আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত সরকার শর্তসাপেক্ষ মিলগুলো চালু করার প্রস্তাব দেয়। প্রস্তাবনায় সরকার শ্রমিকদের বলে, আগামী ৬ মাসের মধ্যে মিল ৩টি যদি আয়-ব্যয় সমান (ব্রেক ইভেন) অবস্থায় আনা যায় তাহলে সরকার ৯০ কোটি টাকা দেবে। শ্রমিকরা শর্ত মেনে নেয় এবং ৬ মাসে লক্ষ্য পূরণ করে। কিন্তু সরকার তার কথামতো ৯০ কোটি টাকা দেয়নি। ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে। তাও আবার কয়েকটি কিস্তিতে।

এ বিষয়ে স্থানীয় সাংসদ এমপি মোঃ আশরাফ হোসেন সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, 'চেষ্টা চলছে মিলগুলোকে পুনরায় চালু করার। আর যেসব মিল পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে সেগুলো অন্য কোনোভাবে ব্যবহার করা যায় কি না ভাবা হচ্ছে। ইপিজেড করার ব্যাপারে একটি চীনা প্রতিষ্ঠান একটি গ্রুপ ইতিমধ্যে নিউজপ্রিন্ট মিল এলাকা ঘুরে এসেছে।' অবশ্য আশরাফ হোসেনের মন্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলেন আওয়ামী লীগ নেতা মুন্নুজন সুফিয়ান। তিনি বলেন, 'সরকার এ মিলগুলো চিরতরে বন্ধ করে দিতে চায়। দেশের পাট পাচার হয়ে যাচ্ছে আর মিলগুলো পাট পাচ্ছে না। সরকারের আন্তরিকতা থাকলে এমনটি হতো না।' সাবেক কমিশনার ও খুলনা যুবদলের আহ্বায়ক শাহিনুল জানান, মিলগুলো কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের তালিকায় ছিল। সরকার বন্ধ করে একদিক দিয়ে ভালো করেছে, পাশাপাশি বেকার শ্রমিকদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিয়েছে। গোল্ডেন হ্যান্ডসেক, অবসরে যাওয়া শ্রমিকরা কম্পিউটারসহ বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষা নিচ্ছে। বৃহৎ স্বার্থে অনেক শ্রমিক ভেঙে না পড়ে আবার কর্মমুখী হচ্ছে।

তবে বাস্তবতা হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়া মিলসহ সব মিলের শ্রমিকরা জোট বেঁধেছে। নাম দিয়েছে শ্রমিক ঐক্য পরিষদ। তারা নানা ব্যতিক্রমী প্রতিবাদ করে ইতিমধ্যে সবার দৃষ্টি কেড়েছে। গত রোজার ঈদে তারা কালো ব্যাচ ধারণ করে খুলনার প্রধান সড়ক বিআইডিসি রোডে নামাজ পড়ে। থালা-বাটি নিয়ে বুভুক্ষু মিছিল করে গত ১১ ফেব্রুয়ারি। এরপর ১৬ ফেব্রুয়ারি করে 'খোরা মিছিল'। ২৩ ফেব্রুয়ারি করে 'ঝাড়ু মিছিল'। এ ছাড়া সর্বাত্মক হরতাল, শ্রমিকের ছেলেদের মিছিলসহ নানা প্রতিবাদ করে আসছে। শ্রমিকদের প্রতিবাদের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখা দরকার।